বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের মননচর্চা: বহুস্বরিক শিল্প-বৈভব

নবনীতা বসু

ব্যতিক্রমী চিন্তনের ঐশ্বর্যে জারিত বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ-বিশ্ব। তাঁর জগৎ অধ্যয়নের, সত্য-সন্ধানের। তাঁর কাছে প্রবন্ধ আসলে উপলব্ধির নিরন্তর নির্মাণ, দার্শনিক সত্তা ও সাহিত্যতত্ত্বের যথার্থ প্রতিবেদন উপস্থাপিত করার জন্য চিন্তা-চেতনা-যুক্তি-অনুভূতির গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে যাত্রা। প্রবন্ধের নানা আয়তনের নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের জন্য তাঁর অধ্যবসায় তুলনারহিত। তিনি গতানুগতিক পদ্ধ তিতে বা যান্ত্রিকভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করেননি, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব নির্মাণে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আলঙ্কারিকদের অনুসারী মতবাদকেও বিনা বিচারে সমর্থন করেন নি। বরং তাৎপর্যবহ যুক্তি পরম্পরায়, তুলনাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর তত্ত্ববিশ্ব ও চিন্তনবিশ্বকে গড়ে তুলেছেন। সাহিত্যতত্ত্ব-নন্দনতত্ত্ব-মার্কসীয় তত্ত্ব-রবীন্দ্রসাহিত্যের ভিন্নতর দিকে উপস্থাপন— তাঁর কাছে অবিভাজ্য সত্যে পৌছানোর প্রয়োজনীয় উপকরণ। এই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব মার্কসীয় ভাবাদর্শ তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ ভাবনার ক্ষেত্রে বিশেষ রূপে বিবেচিত। আসলে তাঁর প্রবন্ধ-বিশ্ব সাহিত্য ও নান্দনিক প্রত্যয়ের যুগলবন্দি।

বাচনভিত্তিক শিল্প-মাধ্যমের মধ্যে প্রবন্ধের যাত্রাপথ সুদীর্ঘ, আয়তন বিপুল ও গতি শ্লথ। প্রাবন্ধিকের পরিচিত ধরনকে স্বীকার করে পদে পদে প্রতিকূলতার সীমা অতিক্রম করা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রবন্ধের বিষয়ভাবনা ও সংযোগী ভাষার প্রকরণ আমূল পরিবর্তিত হয়ে এর অভিমুখ হয়েছে বিচিত্র। অন্যভাবে বলা যায়, প্রবন্ধ-বিশ্বে কোনো স্থির বিন্দু নেই। প্রতিনিয়ত সৃষ্টি-সামর্থ্যের জগতে বদল ঘটেছে। নতুন নতুন বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে, আবার কখনো বিষয় প্রকাশভঙ্গি ও চিন্তনের পার্থক্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নতুন সময় যত নতুন অনুভূতি-উপলব্ধি নিয়ে আসছে, তত বয়নবিশ্ব প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিতে পুনর্নির্মিত হচ্ছে এবং সংরূপ ও তাৎপর্যের নতুন উচ্চাসনের সূত্র ধরে সাম্প্রতিক কালের প্রেক্ষাপটে তাকে নতুনভাবে চিনে নিতে, জেনে নিতে পারছি আমরা।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের বিপুল ভুবনে প্রথমে আমাদের আকর্ষণ করে, শিল্প-মাধ্যমের নবায়মান প্রকাশ। রীতি-প্রথার সনাতনী পাঠ-ঐতিহ্যকে ভেঙে নতুনত্বের যে আবাহন তা একজন গবেষক তথা পাঠকের দৃষ্টিতে কালোত্তীর্ণ। তাঁর প্রত্যেক প্রবন্ধ-প্রতিবেদনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই—যুক্তি ও তাৎপর্য সঞ্চারের অপরিসীম দক্ষতা। তিনি নিজস্ব ধরনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের তত্ত্ব ও সাহিত্য থেকে শিল্প ও সত্যের নির্যাস

আত্মস্থ করে নিয়েছেন এবং সমালোচনার, প্রতি-তুলনার রসসিক্ত, যুক্তিনিষ্ঠ ভাবনার বিস্তার কাটিয়ে চলেছেন আজও সমানে। তিনি বাচন থেকে বিবরণের ভার সরিয়ে দিয়ে তাতে যুক্তিপরম্পরায় বিশ্লেষণের পরিসর সংযুক্ত করে দিয়েছেন। প্রতিটি প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ প্রেক্ষিতনির্ভর হয়ে প্রতি-তুলনার নান্দনিকতাকে উপস্থাপিত করেছে। আমাদের চলমান পাঠ-প্রক্রিয়ার মধ্যে যে বিষয় হারিয়ে গেছে কিংবা দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, তাকে তিনি নতুন তাৎপর্যে, নতুন অন্বয়ের উত্তাপে পুনর্জীবিত করে তুলেছেন। এই নিরিখে তিনি প্রবন্ধ-বিষয়ে গল্প-কবিতা-উপন্যাসের আকরণ ও নির্মিতিবিজ্ঞানকে অভূতপূর্বভাবে নতুন ভাবে উদ্দীপিত করে তুলেছেন। প্রবন্ধ-বিষয়ে তাৎপর্যের সমগ্রতা যেহেতু বিচার্য, এক্ষেত্রে তাঁর লিখন-শৈলীর মধ্যেও খুঁজে পাই পান্ডিত্যসুলভ গাম্ভীর্য ও প্রগাঢ়তা। মননসমৃদ্ধ ভাবনা বা বিশ্লেষণের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী বা অজস্র বিষয় ও উপকরণের সহাবস্থান ও চুলচেরা বিশ্লেষণের জন্য নিত্য-নতুন যৌক্তিক পর্যবেক্ষণ তাঁর মৌলিকতার এক পদক্ষেপ। তাঁর নিজস্ব চিন্তাপ্রণালী বিকাশের ক্ষেত্রে অধ্যয়নের বৈচিত্র্য ও বিপুলতা যে খুব তাৎপর্যপূর্ণ তা তাঁর রচনার বিষয়কেন্দ্রিক অভিনবত্বের দিকে দৃক্‌পাত করলে স্পষ্ট হবে। তাঁর প্রবন্ধ-বিষয় নির্মাণকে আমরা তিনটি স্তরে বিভাজিত করে আলোচনায় অগ্রসর হব। যথা—

ক. সাহিত্য আস্বাদনের নতুন উড়াল, 'কথা নিয়ে কবিতা নিয়ে'।

খ. সাহিত্যতত্ত্ব ও নন্দনতাত্ত্বিক ভাবনার যুগলবন্দি।

গ. রবীন্দ্রসাহিত্যের বৈচিত্র্যময় আবহ।

বাংলা প্রবন্ধের বিষয়-অভিমুখকে বদলে দিয়েছেন তিনি। একদিকে মৌলিক ভাবনার সৃজনা, অন্যদিকে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা সমালোচনার ভূমিকা পালন-এই দু'য়ের সমন্বয়ী ভাবনায় তিনি দীক্ষিত।

ক. সাহিত্য আস্বাদনের নতুন উড়াল, 'কথা নিয়ে কবিতা নিয়ে' ঃ

প্রাত্যহিক জীবন কিংবা চেনা পাঠাভ্যাসের আদল থেকে কীভাবে বহুমুখী অভিব্যক্তি ও বিচিত্র ধরনের কৌণিকতা আবিষ্কার প্রবন্ধ-শিল্পের অলিন্দে উঠে এসেছে তা প্রাবন্ধিক আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর রচনাশৈলীর নিরপেক্ষতা, দ্বিধাহীন নিশ্চয়তা। স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী মূল লক্ষণ। অধ্যয়ন-অনুশীলন ও বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ সূত্রে তাঁর প্রায় প্রত্যেক-প্রতিবেদনের বেশি মনোযোগ দাবি করে। কিন্তু এর থেকেও প্রধান কথা, প্রতিটি প্রবন্ধ-প্রতিবেদনের পিছনে সক্রিয় থেকেছে সুচিন্তিত অনুসন্ধান ও তুলনাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রণালীবদ্ধ বিশ্লেষণ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিচিত্র নির্মাণ থেকে অনাবিষ্কৃত বিষয় নির্মাণে স্রষ্টার শৈল্পিক উপস্থাপন শৈলী।

'সাহিত্যের মানচিত্র ঃ দ্বীপ থেকে মহাদেশ' প্রবন্ধ গ্রন্থটির প্রথম প্রবন্ধ থেকে একটা আবহ প্রাবন্ধিক তৈরি করে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ একটি অখন্ড সূত্রে গ্রথিত। প্রাবন্ধিক নিজেই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছেন, 'এই বই-এ সাহিত্য সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্ন থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের কবিতা-উপন্যাস নানা কিছু আলোচনা করেছি তুলনামূলক পদ্ধতিতে। শব্দ ধ'রে ধ'রে প্রবন্ধও কবিতা পাঠ করেছি যেমন, তেমনি অস্তিবাদী দর্শন,

মার্কসীয় দর্শন প্রভৃতির আলোকে সাহিত্য বিচারও করেছি।'[১] প্রাবন্ধিকের অভিপ্রায় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আলোচনায় প্রবেশ করে প্রথমেই যা আমরা দেখি, তা হল প্রবন্ধগুলি আয়তনে দীর্ঘ নয়, কিন্তু বিষয় গভীর ও ভাষা বিষয়ের অভিমুখী।

'দ্বীপ থেকে মহাদেশ' প্রবন্ধে সাহিত্যের ভাষা নিয়ে আলোচনা। প্রাবন্ধিক এক্ষেত্রে সাহিত্যের ভাষা ও প্রাত্যাহিকের ভাষার মধ্যে শব্দগত বৈচিত্র্যের দরুন তাদের মধ্যেকার ভিন্নতাকে উপস্থাপন করেছেন বিভিন্ন দার্শনিক ও ভাষাতত্ত্ববিদদের সুচিন্তিত মতামতের আলোকে। তাঁর মতে 'সাহিত্য' কম্যুনিকেশনের সর্বোত্তম উপায়'[২] না হলেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। দ্বিতীয় প্রবন্ধে বিষয়ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে কাব্যের চিত্ররূপময়তা। চিত্ররূপ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর প্রাবন্ধিক, কাব্যের বাচনাতীত সংকেতকে, কবির স্বতন্ত্র প্রতিভার কথা বলেছেন। চিত্ররূপের সংরক্তিতায় কাব্য আমাদের বোধ ও বোধির জগতে নিয়ে যায়। তিনি হোরেস ও লঙ্গিনুসে প্রদর্শিত পথে কবিতাভাবনা ও কাব্যতত্ত্ববিষয়ক সুচিন্তিত আলোচনার ক্ষেত্রে কাব্যদেহ ও কাব্যাত্মার নিগূঢ় সম্পর্কের কথা বলেছেন। জাঁ-পল সার্ত্রর সাহিত্যতত্ত্বচিন্তার সঙ্গে আমরা ভারতীয় রসবাদীদের চিন্তার সাদৃশ্য খুঁজে পাই। একজন সাহিত্যিকের প্রধান প্রবণতা শুধু যে নয়নমুগ্ধকর সাহিত্য সৃষ্টি নয়, বরং অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করা ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য হতে পারে। সে সম্পর্কিত সুচিন্তনের সাক্ষ্যবনায় রেখেছেন প্রাবন্ধিক। তিনি জাঁ-পল সার্ত্রকে 'যথার্থ humanisty' বলেছেন এবং তাঁর সাহিত্যবিষয়ক সিদ্ধান্তকে 'মানববাদী সাহিত্য-স্রষ্টারই সিদ্ধান্ত' বলে গণ্য করেছেন।[৩]

বাদ্যকার ঈশ্বরচন্দ্রের গদ্যশৈলী, বাকশিল্পী বিবেকানন্দের মননপ্রধান গদ্যরচনার কলাকুশলতা। সুকুমার রায়ের সাহিত্য জগতে 'ননসেন্স' বাতাবরণ তৈরি, 'যযাতি'র কাব্যশরীরে মিথের নির্মাণ কিংবা এলিঅট ও তলস্তয়ের সাহিত্য প্রভাব-এমনি নানা বিষয়ের অবতারণার মধ্য দিয়ে প্রাবন্ধিক দেখাতে চেয়েছেন, ভাবসঞ্চারের সহায়ক হিসাবে ভাষা যেমন দ্বীপ থেকে মহাদেশের মানুষকে বেঁধে ফেলতে পারে, তেমনি একজন সাহিত্যিক তাঁর মনের বাঁধনে বাঁধেন সমস্ত বিশ্বের মানুষকে, 'অর্টের জন্য আর্ট' কথাটি যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁরাও কিন্তু মানুষকেই সেই আর্টের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেন। আর যাঁরা সাহিত্যের প্রগতিবাদে বিশ্বাসী তাঁরা চেষ্টা করেন সাহিত্যকে স্বাধীনভাবে মানুষের পক্ষে, মানুষের জন্য সার্থক হয়ে উঠত।

'এক আকাশ দুই নক্ষত্র ঃ তারাশঙ্কর-জীবনানন্দ' গ্রন্থের প্রত্যেকটি প্রবন্ধে কথা ও কবিতার, কথাকার ও কবির-যুগ্ম ভাবাদর্শের মধ্যে সূক্ষ্ম অন্বয় স্থাপিত হয়। প্রাবন্ধিক এখানে ব্যক্তিঅস্তিত্ব ও সামাজিক অস্তিত্বের নানা স্তরকে নানা জিজ্ঞাসায় বিদ্ধ করেছেন। প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন, কামনা, সাফল্য, ব্যর্থতার ঘূর্ণাবর্তে মানুষ ঘুরছে, অথচ তার উত্তরণ ব্যতীত অস্তিত্বের মূল্য নেই। তারাশঙ্করের শ্রীনাথ ডাক্তার জীবন বোধে ব্যাপৃত হয়ে সত্তার সন্ধানে আত্ম-বিলোপের গহ্বরে নিমজ্জিত হয়, গরগরিব জীবনে সত্তার বহুত্বে কূটাভাসের ক্ষেত্র তৈরি হয়। 'জলসাঘর' এর বিশ্বম্ভর রায়, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র করালী কিংবা

'আরোগ্য নিকেতন'-এর জীবনমশায়, 'তারিনী মাঝি'র তারিনী-এঁরা প্রত্যেকেই অস্তিত্বের নতুন সন্ততি। 'তথাকথিত সুখ নয়, শান্তি নয়, অন্য এক সুন্দর অভ্যাসে আপন অস্তিত্বকে সার্থক করার অভিলাষী মানুষ।'[৪] যে মানুষ মিথ্যা অস্তিত্বের মুখোশ পরে আদেশ দেয় নির্মম কণ্ঠে, আবার সেই মানুষ জীবনপথের পথিক হয়ে বাঁচেন সামাজিক অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে, বলে ওঠেন 'জীবন এত ছোট কেনে?'[৫] সত্তা ও সত্যের এই গভীর সম্পর্ক নির্ণয়ে প্রাবন্ধিক ব্যবহারিক বিশ্লেষণের যে পথ বেছে নিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে অভিনব। প্রাবন্ধিক, জীবনানন্দের কবিতাবিশ্বেও খুঁজেছেন সেই অস্তিত্বহীনতার স্বাক্ষরকে 'অনিশ্চয়তা', 'অবিশ্বাস' থেকে জন্ম নেওয়া 'নিঃসহায়তা', 'একাকীত্ব'কে। কিন্তু যখন জীবনানন্দ 'তবু কেন এমন একাকী? তবু আমি এমন একাকী' উচ্চারণের পরও বলেন 'মৃত্যুরেও তবে তারা হয়তো ফেলিবে বেসে ভালো'[৬] —তখন প্রাবন্ধিকের মতো আমাদেরও মনে হয়, 'অস্তিবাদ কোনো নৈরাশ্যবাদী দর্শন নয়।'[৭] বরং শূন্যতা থেকে সম্ভাবনার জন্ম, যা জীবনানন্দীয় কাব্যের আলোর সনধান, 'অপ্রেমের থেকে প্রেমে, গ্লানি থেকে মহাজিজ্ঞাসায়' পৌঁছানোর সংকেত।[৮]

প্রাগুক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধে কথাকার তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক সত্তার সংবেদনায় ধৃত অনুভূতি, অভিজ্ঞতা সঞ্জাত চিন্তা দর্শনকে বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের আলোকে ধরতে চেয়েছেন। তিনি তারাশঙ্করের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে বিধৃত সমকালীন সমাজের বিকৃত রূপ। মানুষের আদিম প্রবৃত্তি, তাদের জীবনের সংকট-দ্বন্দ্ব-বিরোধ, তাদের অবস্থান প্রভৃতি বিষয়কে সহজাত দক্ষতায় সীমিত পরিসরে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্যই ছিল অনালোকিত ব্রাত্য মানুষের পরিসরকে পুনর্নির্মাণ।

তাঁর প্রবন্ধের পর্যায় বিন্যাস দেখে মনে হয় এইভাবে যেন আমরা বিষয়ের দিকে তাকাইনি, দেখতে চাইনি মানুষকে, দেখতে চাইনি স্রষ্টার সৃষ্টিনির্মাণকে। নতুন এক দর্পণের সম্মুখীন হই আমরা। সেখানে জীবনতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব, উপন্যাসতত্ত্ব, কবিতাতত্ত্ব ও তাদের পাঠ-যুগলবন্দি সুরের মূর্চ্ছনায় অনুরণিত হয়।

'ঐতিহ্যের সরণিতে' ও 'বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে' এই দুই প্রবন্ধের একদিকে বর্ণিত হয়েছে ঐতিহ্যের সোপান বেয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফলশ্রুতি গ্রহণ করতে করতে কথাকার তারাশঙ্কর এবং কথাকার ও কবি জীবনানন্দ কীভাবে তাঁদের গল্প-উপন্যাস-কবিতায় শেকড়ের টানকে অনুভব করেছেন অপরদিকে তাঁরাই কীভাবে ক্লিষ্ট-ধ্বস্ত সমাজ-সময়ের ভাষ্যকার রূপে নষ্ট সভ্যতার মধ্যেও প্রেম ও সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়ে প্রতিভার স্পর্শে হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বনাগরিক। বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র আখ্যানের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি কথাসাহিত্যের উৎস-বীজকে ক্রমাগত অঙ্কুরিত করেছেন যার প্রতিফলন দেখতে পাই 'রাইকমল', 'স্বর্গ-মর্ত', 'রাধা' উপন্যাসে, 'হারানো সুর', 'চোখের ভুল', 'মালাচন্দন', রসকলি কল্পে। তবে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন, কোনো কোনো গল্পে তারাশঙ্কর বৈষ্ণবীয় রসোচ্ছ্বাসে 'চরিত্রের বাঁক পরিবর্তনকে উপেক্ষা করে আকস্মিকতার উপর নির্ভর করে নিতান্তই একটি প্রাগাধুনিক গাল গল্প শুনিয়েছেন।'[৯] তিনি

এও দেখিয়েছেন, প্রাগাধুনিক শ্রুতিসাহিত্যের আখ্যানে কথাসাহিত্যের শেকড় নিহিত রয়েছে এবং এই 'ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ ধারক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।'[১০] কথাসাহিত্যের গন্ডী পেরিয়ে কবিতার জগতেও প্রাগাধুনিক সাহিত্যের দ্যুতি বা কিরণসম্পাদত লক্ষ্য করা যায়। তাই জীবনানন্দের কবিতায় 'ইতিহাসের সময় চিহ্ন' ও 'ভূগোলের স্থানাঙ্ক' পেরিয়ে ঐতিহ্যের অনুসন্ধানী হয় পাঠক-মন। এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক, রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের কাব্যাংশের প্রতি-তুলনা এনে দেখিয়েছেন, পুরানোর ধারাবাহিক অনুভূতি নয়, বরং পুরানোকে আত্তীকরণের মধ্য দিয়েই শিল্পী কালোত্তীর্ণ হন, 'ইতিহাস খুঁড়ে রাশি-রাশি দুঃখের খনির ভিতর থেকে ("হে হৃদয়") বহমানকালেই কবিকে নৈর্ব্যক্তিক হতে হবে এবং সমর্পিত-চিত্ত হতে হবে সৃষ্টির প্রতিটি অংশে।'[১১] আর এখানেই শিল্প সার্থক হয়।

দ্বিতীয় প্রবন্ধের সারবত্তা-যেকোনো শিল্প মাধ্যম যুগপৎ জাতীয় ও প্রত্যেক কথাকার বা কবির নিজস্ব ভূগোল-ইতিহাস-বিশ্ববীক্ষার একান্ত বৈশিষ্ট্য, থাকলেও তা সর্বতোই হতে পারে আন্তর্জাতিক। মূলত কথাসাহিত্য জন্মলগ্ন থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুগলবন্দিতে বিকশিত বলে তার বহুমাত্রিক বিবর্তন ঘটে। একারণে তারাশঙ্কর শিল্পী, আঞ্চলিক কথাকার নন। আবার তারাশঙ্করের থেকে জীবনানন্দের কবিতার অধিকার বৈশ্বিক আবহে অনেক বেশি স্বীকৃত ও গৃহীত। টি.এম.এলিঅটের 'The waste Land' যে সময়-প্রেক্ষাপটে লেখা তাকে বুঝতে যদি আমরা জীবনানন্দের কবিতা পড়ি তাহলে দেখবো দুই জগতের বাসিন্দা হয়েছে তাঁদের সংবেদনশীলা কোথায় যেন এক হয়ে গেছে, বিশ শতকের গোধূলিবেলায় ক্রমবর্ধমান অভিঘাত প্রতিটি মহাদেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত হলেও কোথাও যেন শুনতে পাই 'Love is the unfamiliar name'[১২] আর কোথাও দেখি কবি এই বিশ্বাসে বলছেন 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।'[১৩]—জাতীয় ও আন্তর্জাতিকতার একটানা প্রবাহ সব রৈখিকতা শুধু মুছে দেয় না, অন্যোন্য সম্পৃক্তও হয়ে যায়।

'দুই স্রষ্টার নন্দন ভাবনা' প্রবন্ধাংশেও তারাশঙ্কর ও জীবনানন্দের নান্দনিক প্রত্যয় যে কথা সাহিত্য ও কবিতার ভাবাদর্শের সমস্ত বিভাগকে খনন করে শিল্পের প্রকৃত তাৎপর্যকে নির্মাণ করে তাকে চিহ্নিত করেছেন প্রাবন্ধিক। মম ও তলস্তয় নির্দেশিত সাহিত্যিকের বিশেষত্বকে ধারণ করেছেন তারাশঙ্কর। কিন্তু জোলা ও মোপাসাঁর রীতি থেকে ভিন্ন হয়েছে তারাশঙ্করীয় ঘরানা। এক্ষেত্রে 'কন্টেন্ট' ও কর্মের অভিন্ন মিলনকে তিনি দেখিয়েছন। জীবনানন্দের কবিতার নান্দনিকতা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক, সমর সেন ও বুদ্ধদেব বসুর নান্দনিক ভাবনার তুলনা এনে দেখিয়েছেন জীবনানন্দ রোমান্টিক ছিলেন, তবে তা Reality কে মেনে নিয়েই। তাই তাঁর সৃষ্টি 'রিয়ালিজম' ও 'রোমান্টিসিজম' এর সমন্বয়ী রূপ। কিন্তু প্রাবন্ধিক এক্ষেত্রে পাঠককে কবিতা ও উপন্যাসের সঙ্গে প্রবন্ধকে মিলিয়ে পড়তে বলেছেন। তাঁর মতে জীবনানন্দের মুখ্য অবলম্বন তিনটি 'কল্পনা, অভিজ্ঞ তা ও দীর্ঘদিনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যে উত্তরাধিকার।'[১৪] এছাড়াও উভয়ের ক্ষেত্রে সত্তার দ্বান্দ্বিকতা কিংবা মহাসময়ের অনেকান্তিক লক্ষণ ও কীভাবে তাদের নন্দনভাবনায় লালিত হয় তা দেখিয়েছেন। প্রাবন্ধিক,

ফেলে আসা অতীতের খন্ড মুহূর্তের পদচ্ছাপ এবং আসন্ন ও সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ইঙ্গিত সমবায়ে যে নান্দনিক বোধ গড়ে ওঠে তাকেই বিভিন্ন পাঠ প্রতিবেদনের আলোকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। বিমল বাবুর প্রবন্ধ আমাদের নতুন করে দেখতে শেখায়, নতুন এক ভাবনার পরিমন্ডল গড়ে দিয়ে তাকে দেখার মতো চোখ ও মন তৈরি করে দেয়।

'সাহিত্য ঃ সত্য ও সুন্দরের অন্তরমহল' গ্রন্থে বিষয়কে চারটি শ্রেণিবিন্যাসে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্বে রয়েছে সাহিত্যের সূক্ষ্ম ও দ্যোতনাসম্পন্ন নানা দিকের উপস্থাপন, দ্বিতীয় পর্বে কবিদের গদ্যকারের ভূমিকা এবং তৃতীয় পর্বে রয়েছে বিভিন্ন কথাকারের কথা সাহিত্যের ভুবনে বহুমুখী বিষয়ের অন্তর্বয়না। চতুর্থ পর্বে বাদল সরকারের নাট্য প্রতিভা নির্ণয়। প্রবন্ধ গুলির পর্বে পর্বে লক্ষ্য করি অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞ তার ব্রহ্মবিবর্তনকে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর মেধা ও জ্ঞ ানের সংমিশ্রণ আমাদেরকে হতবাক করে, আমরাও প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয়ের দর্পনে নিজেদের জ্ঞ ানের অপূর্ণতাকে চিনে নিতে পারি।

'সাহিত্যের তুলনামূলক পাঠ' প্রবন্ধটি মূলত 'সাহিত্যপাঠের তথা বিচারের বিচিত্র পদ্ধ তির মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য তার সার্থক প্রতিবেদন।[১৫] বিষয়ের অনুসন্ধান সরলরৈখিক নয়, বরং তার প্রধান পাঠ, পার্থক্য ও সমান্তরালতায় নিরন্তর এগিয়ে যাওয়ার। একারণেই প্রাবন্ধিক লিখেছেন ধীমান বিশ্লেষণপন্হী এবং শৈলী বিশ্লেষণপন্হী প্রত্যেকেই তুলনামূলক পদ্ধতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নেন। উনিশ শতক থেকে তুলনামূলক পদ্ধতির চটার ধারা আজও অব্যাহত। এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক আধুনিককালের সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়কে, সেই সঙ্গে সাহিত্যিকদের বাচন শৈলীকে শুধুমাত্র কর্তা-কর্ম ক্রিয়ার সম্পর্কে অনুসন্ধান না করে তুলনাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে বলেছেন। ভাষিক ভিন্নতা এক্ষেত্রে অন্তরায় হলেও এ সমস্যা সহজেই যে গবেষকরা অতিক্রম করতে পারবেন তাকেও প্রাবন্ধিক বিজ্ঞ ানমনস্ক ভাবনায় স্পষ্ট করেছেন। 'রূপান্তর' প্রবন্ধটিও অভিনব তার বিষয়ভাবনায় ও উপস্থাপনরীতিতে। 'শব্দ ও অর্থের নিত্যলীলা'য় সুরের সংযোজন এক ভিন্ন মাধুর্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। অনেক সময় সাহিত্যের অনুবাদে প্রকৃত সাহিত্য ভাব ও রস-উপলব্ধি হয় না, সেক্ষেত্রে সুরের দ্যোতনা আমাদের অপার্থিব জগতে নিয়ে যায়। আসলে অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা সেই Emotive Value কে পাই না যেখানে 'transference' এর আনন্দ আস্বাদন করা যায়। প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। প্রাবন্ধিক সুরসিক মেজাজে এই প্রবন্ধে লিখলেন, 'কথা ও সুর, চলেছে পরস্পরের অভিসারে। সুর যদি হয় বাঞ্ছিত, তাহলে কথা হল অভিসারিকা'।[১৬] অন্যান্য প্রবন্ধ আলোচনায় প্রাবন্ধিক যেখানে তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, সেখানে এই প্রবন্ধে তিনি সরসতার আবহ নির্মাণ করেছেন।

জাঁ-পল সার্ত্র ও তলস্তয়-এঁরা দুজনেই তাঁদের দর্শনভাবনা ও সাহিত্য ভাবনার দ্বারা সেই জগৎকে প্রত্যাশা করেছেন যেখানে 'শোষণ'-ধ্বংসের শেষে আত্মতা ও বিশ্ববোধের সম্মিলিত জীবন-জগৎ গড়ে উঠবে। এঁদের ভাবনার ধ্ কেন্দ্র 'মানব প্রেম'— যা

রবীন্দ্রসাহিত্যেও। বিস্মিত প্রাবন্ধিক, সার্ত্র-র ভাবনার ভিত্তিভূমি স্থাপন করেছেন মার্কসীয় আদর্শের বীক্ষনে। তিনি সার্ত্র-র একটি রচনাংশ উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, 'সাহিত্যিক যদি নিজেকে সকলের কাছে তুলে ধরতে চান এবং সমস্ত পাঠকের-আনুকূল্য কামনা করেন তা'হলে তাঁকে জনগণের বৃহত্তম অংশ-লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্তের কাছে নিজেকে বিস্তৃত করে দিতে হবে।'[১৭] সমান্তরালে তলস্তয় সম্পর্কে প্রাবন্ধিক যখন লেখেন, 'তলস্তয় লেনিন বা গোর্কির মত 'শোষণ মুক্ত সমাজ' কথাটা বলেন নি, কিন্তু উদারপন্হী মানবপ্রেমিক অন্তর থেকে ঘৃণা করেছেন সবশ্রেণির কামবিকারগ্রস্তদের এবং ডানহাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শোষণহীন মুক্ত সমাজের মানুষের দিকে'[১৮] তখন আমাদের মনে হয় বাঙালির সাহিত্য ভাবনা মানবপ্রেমবোধের মঙ্গলারতির সন্দীপনী স্পর্শে জেগে উঠবে।

'সাহিত্য' ঃ পুরাবৃত্তের বৈধ উত্তরাধিকারী' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সাহিত্য বিজ্ঞান এমনকি চলচ্চিত্রের সঙ্গে মিথের অন্যান্য নিবিষ্টতার কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধ-কবিতার উল্লেখসূত্রে দেখিয়েছেন পুরাণের আধুনিকীকরণ রূপ—'পুরাণ-কে ভেঙে নতুন জীবনের কাহিনীকে রূপান্তরণ—এখানেই তো মিথের Collective Consciousness হিসাবে সার্থকতা।'[১৯] প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধের বহুবিচিত্র অনুপুঙ্খ গুলির প্রতি সাভিনিবেশ দৃষ্টিপাত করে বুঝে নিই 'পুরাবৃত্ত' বা আর্কেটাইপ যে সাহিত্যিক সত্য নির্মাণ করে তা নিয়ত রূপান্তরশীল। তার ক্ষয় নেই, লোপ নেই।'[২০] অনুরূপভাবে 'সাহিত্য' বাস্তবতা থেকে যাদুবাস্তবতা' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সংজ্ঞা বা তার অভিপ্রেত তাৎপর্যের মোড়কে প্রবন্ধটিকে বেঁধে ফেলতে চাননি, বরং প্রবন্ধকে ভুবনভ্রমণমাঝে' সাহিত্যিকের নিজেকে খোঁজা, শিল্পসাহিত্যের মাধ্যমে বাস্তব থেকে গৃহীত উপাদান সংগ্রহ করে মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা 'স্বপ্নময় বাস্তবের প্রতীকায়িত রসাত্মক শিল্পরূপের উপস্থাপন'[২১] এর গভীর তাৎপর্যের পরিসরে নিয়ে গেছেন। এখানেও 'প্রাবন্ধিক একই সঙ্গে অভিযাত্রী, অন্বেষক ও ভাষ্যকার।

'উপনিবেশ এবং নব্য উপনিবেশের বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' প্রবন্ধটি শুধুমাত্র বিষয়ের আভিজাত্যে নতুন নয়, বরং প্রথাবদ্ধ প্রবন্ধের গঠনশৈলী থেকে ভিন্ন পথগামী (প্রাবন্ধিক নিজেই উল্লেখ করেছেন 'প্রথাবহির্ভূত উপসংহার')। এক্ষেত্রে বিষয়ের পুঙখানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ না গিয়ে শুধু উপসংহারেই আমাদের অভিনিরেশকে নিবদ্ধ করবো-জীবনানন্দ দাশ তসলিমা নাসরিন ও দিলীপ দাসের তিনটি কবিতাই এই প্রবন্ধের যাবতীয় তাৎপর্যের ধারক। আসলে ঔপনিবেশিক শোষণের অবসান ঘটলেও আমাদের মননে-বীক্ষনে-সাহিত্যে অর্থাৎ প্রকাশ মাধ্যমে সেই উপনিবেশগ্রস্থ চিন্তা-ভাবনা প্রকট হয়ে থাকে। তবুও সাহিত্যিকরা কোনো আবিলতায় না জড়িয়ে অভিজ্ঞ তা উপলব্ধি দিয়ে সাহিত্য-প্রতিবেদনের নবীন পরিসরকে পৌছে দেন পাঠকের কাছে। নব্য-উপনিবেশের বন্ধুর পাথুরে জমিতে দাঁড়িয়েও কবি তাই উচ্চারণ করেন, 'শ্মশানে-ধ্বনির মতো যখন জয়ধ্বনি বাজে/প্রতারিত দেশ আমার নোনাজলে ভাসে।'[২২] এই দীপ্ত-উচ্চারণ সমগ্র প্রবন্ধের মূল মন্ত্র, বেদবাক্য। 'গণমাধ্যম ও বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন গণমাধ্যমের সর্বাত্মক আক্রমণে সাহিত্যজগৎ বিপর্যস্ত। আধিপত্যবাদের চতুর কৌশলী

ফাঁদে বন্দী আজ সমাজবাদে বিশ্বাসী সাহিত্যিকরা। প্রাবন্ধিক এখানেই তর্জনী তুলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন মূলের সন্ধানে বেরিয়েও আমরা পশ্চিমের দিকে হাত বাড়িয়ে রেখেছি। অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদে ও উগ্র আগ্রাসনে আজ মন ক্লিষ্ট। তাই তিনি প্রতিষেধক হিসাবে 'সুস্থ-সাহিত্য'কে নির্বাচন করেছেন যার হাত দিয়ে আমরা মহাবিশ্বকে স্পর্শ করতে পারবো, জীবনানন্দীয় ভাষায় বলতে পারবো, 'শুধু একসত্য আছে পৃথিবীতে[২৩] এক আলো, —রহিয়াছে সে এক সুন্দর/ আকাশ-বাতাসে-জলে- অন্ধকারে আমাদের সব আলোড়ন আয়োজনে।' এ প্রবন্ধগ্রন্েহর দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট করেছেন, 'শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে নজরুল', 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যভাষা', 'বিষ্ণু দে ঃ দুই ঐতিহ্যের সমবায়'। —প্রবন্ধত্রয়ের মূল ভাবনা—গদ্যকারের ভূমিকায় কবিরা। প্রথম প্রবন্ধের ভূমিকাংশে প্রাবন্ধিক লিখেছেন নজরুলের প্রাবন্ধিক সত্তার অনালোচিত অধ্যায় উন্মোচন তাঁর এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। নজরুলের দুই প্রবন্ধকে তিনি আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি নজরুলের গদশৈলীর সঙ্গে নেতাজী ও স্বামীজীর গদ্যের আন্তরধর্মের সাদৃশ্যকে দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন সাম্যবাদী কবি নজরুলের লেখনী দিয়ে স্বাতোৎসারিত ভাবে রচিত হয়েছে সাহিত্য সৃষ্টির জটিল তত্ত্ব—'সত্য', 'সুন্দর', 'মঙ্গলে'র যথাযথ ব্যাখ্যা। শুধু তাই নয়, তিনি নজরুলকে সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে রেখেছেন। নজরুলের বিশেষ দৃষ্টিকোণ, সংবেদনশীলতা, বিশ্বের কবি-সাহিত্যিকদের বোধের জগতে এনে তাকে প্রয়োগ,—নজরুলের প্রবন্ধরচনায় ত্রুটি—সব খুঁটিনাটি দিক অত্যন্ত বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধ তিতে, প্রজ্ঞা, মনন ও আবিষ্কারকের অনুসন্ধিৎসার ত্রিবেণী ধারায় সিক্ত করেছেন। দ্বিতীয় নিবন্ধে প্রাবন্ধিক। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যভাষায় বাহুবর্ণে রঞ্জিত শব্দ-ভাস্কর্যের ইঙ্গিতবহ সমারোহকে উপস্থাপন করেছেন। ভাষাতত্ত্বের একজন গবেষকসুলভ দৃষ্টি নিয়ে অত্যন্ত যত্নে সুধীন্দ্রনাথের গদ্যভাষার নির্দশন ভূষিত করে তিনি এই মতামত দিয়েছেন, 'শব্দচয়ন, বাক্যসৃষ্টি, একাধিক বাক্যাংশকে সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা বেঁধে দেওয়া সব মিলে সুধীন্দ্রনাথ গড়ে তুললেন এমন গোথিক স্ট্রাকচার যার মর্ম স্পর্শ করার জন্য প্রাচীন গ্রীক হারমোনিক্স বা পিথাগোরীয় জ্যামিতিক সূত্রেরও সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।'[২৪] গদ্যের শরীর নির্মাণে শব্দ, বাক্য, বাক্যাংশের যে বিশেষ ভূমিকা আছে এবং সেই ভূমিকা পালনে যথাযথ রূপকার যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, তা প্রাবন্ধিক প্রবন্ধের বয়ানে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে নিরপেক্ষভাবে উপস্থিত করেছেন। অনুরূপভাবে সতর্কও নিরপেক্ষ গবেষকরূপে বিমলবাবু বিষ্ণু দের সাহিত্য ভাবনা রবীন্দ্রনাথ ও এলিয়টের দুই নক্ষত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি স্বীকার করে বলেছেন, 'আজকের বিশ্বায়নের কালে শিকড়ে পড়েছে টান, তাই বিষ্ণু দে'র মত ভৌগোলিক শাসনহীন কবিকে নিজের মত করে[২৫] পড়ার জন্য খুঁজব তাঁর 'ঐতিহ্য-আনুগত্য' এবং সঙ্গে ভাবী সমাজের স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা। বিষ্ণুদের কাব্য বিষয়, কাব্য-নাম, কাব্য-ভাবে আমরা শেকড়ে ফেরা অতীতের ঐতিহ্যকে দেখতে পাই, দেখতে পাই অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্নও। প্রাবন্ধিক মনোমুগ্ধকার বিনম্র ভঙ্গীতে লেখেন, 'আমি বলি নম্র নমস্কারে বিষ্ণু দে'র হাত উঠে আসে

রবীন্দ্রনাথের প্রতি আর করকম্পন ঘটে এলিয়টের সঙ্গে।'[২৬] পাঠক হিসাবে মনে হয়। প্রাবন্ধিক, ঐতিহ্যের চিরায়তনে ভাবী সময়ের সংলগ্নতাকে বিষ্ণু দের ভাবনার মাধ্যমে পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছেন।

প্রাগুক্ত প্রবন্ধ গ্রন্থের তৃতীয় পর্যায়ে প্রাবন্ধিকের অতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষনে কথাকারের ভুবনে সময়, সমাজ, মানুষ ধরা পড়েছে গাণ্ডুষে সাগরদর্শনের মতো আর সেই সাগরকে রত্নগর্ভে ভরিয়ে দিয়েছে প্রাবন্ধিকের প্রজ্ঞা ও প্রমিতি এবং অভিনব লিখন কুশলতা। তাঁর কাছে বনফুলর গল্প 'Golden daffodil', রূপে, রঙে চমৎকার। চমৎকার গল্পের আয়জন, রসে, বৈচিত্র্যে বিষয়ে ও ভাষায়। প্রাবন্ধিক কাব্যিক মেজাজে লিখেছেন, 'কপালে ছোট টিপ, ফুল মানানসই, খোঁপায়' টাটকা চাঁপাফুল', হাতদুটিতে হালকা চুড়ি আর চোখে লম্বা এমন তন্বী কিশোরী যেন এক একটি গল্প।'[২৭] গল্পের ও গল্পকারের সত্তা বিশ্লেষণে প্রাবন্ধিকের এহেন মন্তব্য তাঁর রসসিক্ত কাব্যিক মনেরই বহিঃপ্রকাশ। জগদীশ গুপ্ত, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিকের কথাসাহিত্য ভুবনও প্রাবন্ধিকের বিশিষ্ট উপস্থাপনায় নতুন হয়ে ওঠে এবং বহুল পঠিত উপন্যাসগুলির পুনর্পাঠের দাবিদার হয়। লোকনাথ ভট্টাচার্য, বিমল কর, নবনীতা দেবসেন, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অমর মিত্র-এঁরা প্রত্যেকেই স্থানিক ও কালিক ক্রমের পারস্পরিক সম্পর্ককে নতুন মাত্রায় তুলে ধরেছেন। প্রাবন্ধিক, এক্ষেত্রে তাঁদের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের বয়ন ও অন্তর্বয়নকে নানামাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, সেই সঙ্গে সমাজ ও সময়-পরিধির সমান্তরালতায় তাঁদের অবস্থানকে স্পষ্টতর করে তুলেছেন। বিশেষ করে নবনীতা দেবসেনের গল্পালোচনায় তিনি যে শুধুমাত্র লেখিকার হাস্যরস সৃজনের দক্ষতাকে (পরশুরাম, শিবরাম, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখার প্রতি তুলনার দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন তা নয়, বরং তিনি একটি Genre কে ধরতে চেয়েছেন যেখানে নবনীতার প্রতিস্পর্ধী আর কেউ নেই। নিবন্ধটি নিঃসন্দেহে প্রারন্ধিকের মুক্ত চিন্তার পরিচায়ক।

প্রবন্ধগ্রন্থের চতুর্থ পর্যায়ে একটি নিবন্ধই আছে যেটি 'নাট্যকর্মী বাদল সরকারকে লেখা খোলা চিঠি' (শ্রুতিনন্দন বক্তব্য শোনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে) দর্শক হিসাবে নয়, প্রকৃত সাহিত্য পাঠকসুলভ জিজ্ঞাসু ও উৎসুক মনোভাব নিয়েই প্রাবন্ধিক, বাদল সরকারের দুটি গ্রন্থ পাঠে প্রবুদ্ধ হন। সেখান থেকে থার্ড থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ এবং তার ফলশ্রুতি এই নিবন্ধটি। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকে উৎসারিত ভালোলাগাকে তিনি নিবন্ধে স্থান দিয়েছেন। তবু কোথাও আবেগের জোয়ার নেই, থার্ড থিয়েটার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় ও বাদল সরকারের নাট্যাবলী থেকে আহত তথ্যকে যুক্তির বন্ধনে বেঁধে সাজিয়ে দিয়েছেন গবেষকের গবেষণার অপেক্ষায়। একদিকে অনুভূতি প্রকাশের সততা, অন্যদিকে প্রাবন্ধিক সুলভ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ-এই দুই সত্তায় ভাস্বর তাঁর এই প্রতিপাদ্য। তাই নির্দ্বিধায় তাঁকে লিখতে দেখি, 'বাদল সরকার আমাদের এই কালের সেই নাট্যকার যিনি মানবতায়-প্রেমে-অন্তহীন অভিযাত্রায় মৃত্যুকে অতিক্রম করে শাশ্বতের দিকে সম্মিলিত অভিযানে বিশ্বাসী। তাঁর দর্শন তাঁর নাট্যরূপকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাঁর নাট্যশৈলী প্রচলিত দুই ছককে ভেঙেছে।... মানুষের বাঁচতে চাওয়া এবং যথাযথ বাঁচতে পারার কথাই তিনি বারবার

জানিয়েছেন। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের প্রচারক না হয়েও মানুষের পক্ষে নাটককে তিনি করেছেন হাতিয়ার।[২৮]

খ. সাহিত্যতত্ত্ব ও নন্দনতাত্ত্বিক ভাবনার যুগলবন্দি ঃ

সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের বর্ণবহুল তাৎপর্য নির্মাণের ক্ষেত্রে বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় দ্রোণাচার্যসম। এই বিষয় সম্পর্কিত বিবিধ আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর চিন্তনের চালিকাশক্তি হিসাবে কার্ল মার্কসের তত্ত্ব ও মতবাদকে গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে প্রচলিত বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলি যাচাই করে দেখেছেন, পুনর্বিন্যস্ত করেছেন এবং পাশ্চাত্য করেছেন এবং পাশ্চাত্য রীতি-পদ্ধতির সঙ্গে তুলনাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার কাছে, ব্যাপৃত হয়েছেন।

সাহিত্যতত্ত্ববিচার ও ভাবনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকর গ্রন্থ 'সাহিত্যবিবেক'। গ্রন্থটি বহুল চর্চিত ও বহুলপঠিত এবং সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার পথ নির্দেশক। প্রাবন্ধিক বিমলবাবু তাঁর প্রাজ্ঞদৃষ্টি ওধীশক্তির মেলবন্ধনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্বকে একই সঙ্গে একই মলাটের ভিতর লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্য জিজ্ঞাসায় প্রাচ্য আলঙ্কারিকবিদ্‌দের কথা জেনেছি, জেনেছি ধ্বনি, রস, ঔচিত্য, রীতি, বক্রোক্তি, অলঙ্কারের লাবণ্যে সৃষ্টির নির্মিতিকে, প্রাবন্ধিক বিমল বাবু প্রথম দেখালেন, প্রাচ্যের গন্ডী কখনো সীমায়িত নয়, বরং তার আঙিনায় প্রবেশ ঘটেছে প্রতীচ্যে সাহিত্যতত্ত্বেরও। তিনি মুছে দিলেন সাহিত্যতত্ত্ব ও ভাবনার সীমারেখা। তত্ব জীবনসত্যের অভিব্যক্তি, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যার প্রকাশ ঘটে কবিতায়- গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে-প্রবন্ধে। তাই একে দেখতে হবে তাত্ত্বিক বিশ্বের বিচারের আলোকে। আর আমরা তো সেই বিশ্বেরই কৌতূহলী পাঠক, জিজ্ঞাসু গবেষক।

শুরু থেকে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন 'শিল্প ও শিল্পীর সার্থকতা আনন্দদানে' এবং 'সহৃদয় পাঠক শিল্পের সমঝদার ও সমালোচক।'[২৯] তিনি হার্বার্ট রীডর উদ্ধৃতি দিয়ে শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে চেয়েছেন। তবে হার্বার্ট রীডে প্রদত্ত সংজ্ঞায় 'সৌন্দর্যে' শব্দটি অনুল্লিখিত থাকায় তিনি এর পরবর্তী প্রবন্ধাংশে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আলঙ্কারিক ও দার্শনিকদের বিভিন্ন মত সাপেক্ষে সৌন্দর্যতত্ত্বের সংজ্ঞা ও স্বরূপকে বিশ্লেষিত করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন 'সৌন্দর্য' শিল্পে 'উপেয়' নয়, 'উপায়'। 'আনন্দকে যাঁরা লক্ষ মনে করেন তাঁরা তো বটেই, এমনকি সমাজপ্রগতিতে সাহিত্যের অংশ-গ্রহণকে সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছেন যাঁরা তাঁরাও শিল্পে সুন্দরকে কামনা করেন শিল্পের স্বার্থেই।'[৩০] তবে শিল্পের জগতে কোনো সীমান্ত রক্ষী নেই বলেই প্রত্যেকে নিজের মতো করে শিল্পের ক্ষেত্র উর্বর করতে পারেন। এই 'শ্রেণীজ্ঞানরাহিত্যের' জন্য প্রাবন্ধিক শিল্প মাধ্যমের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সাহিত্যকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করেন। আবার অনেক বিদ্বজ্জনের মতে তত্ত্বের সঙ্গে নান্দনিকতার অহি-নকুল সম্পর্ক। কিন্তু প্রাবন্ধিক। আমাদের দেখালেন, প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্বে ভাবনার বদল ঘটার দরুণ নন্দন তত্ত্বই সাহিত্যের বৃহত্তর অংশ রূপে বিবেচিত। নন্দনতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মার্কসবাদ পুষ্ট ধারায়

নন্দনতত্ত্বের পরিধি বিস্তৃত করলেন ও তার ভিন্নতাকে প্রতিস্থাপন করলেন যা এই তাত্ত্বিক আলোচনায় অভিনব পন্থার দিশারী।

সাহিত্য-তাত্ত্বিক বীক্ষায় প্রেরণা, প্রতিভা, অনুকরণ, কল্পনা, স্বজ্ঞা ও প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ প্লেটো শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে দিব্য-প্রেরণাতত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন, এই প্রেরণাকে অভিনব গুপ্ত বলেন 'অপূর্ব বস্তুনির্মাণ ক্ষমা-প্রজ্ঞা' যা হল 'প্রতিভা'র অনুরূপ। কান্ট কথিত 'কল্পনা'ও একই গোত্রাধীন। বিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে অ্যারিস্টটল 'অনুকরণতত্ত্ব'কে শিল্পের ক্ষেত্রে তাৎপর্যবহ করে তোলেন। এখানে 'কল্পনা'র উল্লেখ না থাকলেও তিনি শিল্প-সাহিত্যকে অনুকরণের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। একজন শিল্পীই যে কল্পনাকে ভিত্তি করে সাহিত্য গড়ে তোলেন, সেই বিষয়ে প্রাবন্ধিক প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আলঙ্কারিকদের মতামতের প্রতি তুলনার মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণ কাব্যের দেহ ও আত্মার সন্ধানে লিপ্ত, যেখানে প্রতীচ্যের আলঙ্কারিকগণ সাহিত্যের সংজ্ঞা, স্বরূপ, সমাজজীবনে তার ভূমিকা ও গ্রহণযোগ্যতা-এই বিষয়-অন্বেষণে রত।

এই বিষয়ের ব্যাপকতা লক্ষ্য করি প্রাবন্ধিকের 'দেহ ও আত্মার সন্ধানে' শীর্ষক শিরোনামের অংশীভূত প্রবন্ধাবলীতে। এখানে ক্রম-পরম্পরায় শব্দ, কাব্যদোষ, গুণ, অলঙ্কার, বক্রোক্তি, ঔচিত্য, রীতি, ধ্বনি, রস—তত্ত্বের এই বিভিন্ন অলোচনার মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি 'স্রষ্টার সৃজনলিপ্ততা রস সৃষ্টির জন্য, পাঠকের পাঠ-মগ্নতা রসোপভোগের জন্য।'[৩১]

বিভিন্ন উপাদানে গড়া সাহিত্য-রূপে দুই অনুসৃতির জন্ম হয়,—১. বস্তুবাদ, ২. ভাববাদ। এই দু'য়ের চিরকাল বিসম্বাদ। এখানেও প্রাবন্ধিক প্রতীচ্যের দার্শনিকদের সঙ্গে একাসনে শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতাদর্শকে রেখেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই সাহিত্যে বিষয়কে গৌণ বলে রূপকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এরপর প্রাবন্ধিক দেখাতে চেয়েছেন, সাহিত্যতত্ত্ব ও ভাবনার কোনো দোষ নেই। যুগপরম্পরায় সময়ের বিক্ষেপে জন্ম নেয় নতুন মতবাদ। Realism, Naturalism তারই ফসল। বাস্তবতাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ, ভাববাদের বিরুদ্ধ মতবাদ। প্রাবন্ধিক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদের আবর্তে বাস্তবতাবাদের যাত্রাপথ বদলে গেলেও নতুনভাবে নির্দেশিত হয়েছে তার অভিমুখ। জগৎও জীবনকে আমরা আপাতদৃষ্টিতে যেভাবে, যেরূপে দেখি, আসলে তা সেরকম নয়। বহমান সময়ের তরঙ্গ বিভঙ্গে স্বপ্ন-ব্যর্থতা মনকে যত ছুঁয়ে যায়, অস্তিত্ব তত গ্রন্থিল হয়ে ওঠে, 'বিচ্ছিন্নতা', 'নিঃসঙ্গতা', একাকীত্ব গ্রাস করে আমাদেরকে, প্রতীচ্যের দার্শনিকগণ শুধুমার এই অসহায়তাপ্রকাশেই তাঁদের মতবাদকে গন্ডীবদ্ধ করেননি, বরং গভীর মমত্ববোধ থেকে উৎসাহিত সম্ভাবনাময় জীবনকে যে প্রতিস্হাপিত করেছেন শিল্পে-সাহিত্যে সে কথাও প্রাবন্ধিক অত্যন্ত সতর্কভাবে উত্থাপিত করেছেন।

প্রাবন্ধিক যুক্তিশৃঙখলার পারম্পর্যে দেখিয়েছেন, সময় ও পরিসরের বিবর্তনে কতরকম

সাহিত্য-আন্দোলনের সূত্রপাত, কীভাবে বদলে যায় শিল্প-সাহিত্যের চিন্তা-ভাবনার জগৎ, গড়ে ওঠে নতুন নতুন সম্ভাবনার-এসবেরই নিখুঁত পাঠ দিয়েছেন প্রাবন্ধিক। এই পথ ধরে তৃপ্তি পায় আমাদের জিজ্ঞাসু মন। তাই তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা বেড়ে যায় অনেক।

'সাহিত্য-বিচার ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ' গ্রন্থটি গঠনবাদী সাহিত্য-সমালোচনার পদ্ধতি ও তার প্রয়োগভাবনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। পূর্বোক্ত গ্রন্থে তিনি শুধুমাত্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্বকে বিবৃত করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি সাহিত্য বিচার করেছেন তাত্ত্বিক পদ্ধতির আলোকে এবং সেই সঙ্গে প্রয়োগের মাধ্যমে। উনিশ শতক মূলত তত্ত্বচিন্তার সূচনার শতক। প্রতীচ্যের প্রভাবকে স্বীকার করে এই শতকের বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রবেশ ঘটে। মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ-প্রত্যেকের সাহিত্যভুবন প্রাচ ও প্রতীচ্যের সাহিত্যলোকের কিরণ সম্পাতে আলোকিত। তুলনামূলক পদ্ধতির এই সরণি ধরে বর্তমান সময়ের বহু গবেষক। তাত্ত্বিকের অন্বিষ্ট তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে বাংলা সাহিত্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্বের প্রভাব নির্ণয়।

মার্কসীয় সাহিত্যের সঙ্গে বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সংলগ্নতা বহুদিনের। পরিচিত মহল তা তার বাইরে অধ্যাপনার জগতে তিনি পরিচিত মার্কসীয় তাত্ত্বিক রূপে। তাই তিনি যখন 'মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব' শিরোনামে প্রধানগ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখন স্বভাবতই পাঠক ও গবেষক মহলে উৎসাহের বন্যা বয়ে যায় এইভেবে যে বিশিষ্ট অবস্থান ও অধ্যয়নের মাত্রা এই গ্রন্থে কতটা প্রকাশ পাচ্ছে, কীভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

বলতে দ্বিধা নেই যে, এই ভাবনার সমাধান খোঁজার প্রক্রিয়া অনেকাংশে সহজ করে দিয়েছেন তিনি। পূর্ববর্তী গোপাল হালদার ও বিনয় ঘোষের কথা স্মরণে রেখে বলা যায়, প্রাগুক্ত গ্রন্হ মার্কসীয় সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। শিল্প সাহিত্য ব্যক্তিমানুষের সৃষ্টি হলেও কীভাবে তা সামাজিক চৈতন্য বা সামাজিক সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন রূপে জায়মান, সেকথা তিনি প্রথমেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে শিল্পীর কল্পনা ও কোনো স্বেচ্ছাচারী প্রবণতার প্রকাশমাত্র নয়, তা তার শ্রেণিগত চেতনারই এক অভিজ্ঞান, জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার এক প্রয়োজনীয় উপকরণ। এ প্রসঙ্গে আলোচনায় এনেছেন শিল্পীর কর্তব্য প্রসঙ্গ। তিনি দেখিয়েছেন যে শিল্পের মূল নিহিত আছে জনচেতনার গভীরে, সেই জনচেতনাকে উদ্দীপ্ত করে প্রগতির পথে চালনা করাই শিল্পীর কর্তব্য।

এর সঙ্গে তিনি জোর দিয়েছেন সাহিত্যের বাস্তবধর্মিতার দিকে। চরিত্রের যথাযথ রূপায়ণ ও বর্ণনীয় বিষয়ের প্রতি ঐতিহাসিক শোভনদৃষ্টির কথা ও উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনি 'Socialist Realism'-এর কথা এবং সমাজমুখী সাহিত্যিকের নিজস্ব অর্থস্তুতির ক্ষেত্রে পছন্দ করে নিজের দায়বদ্ধতা, নিজের কাছে নিজের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার কথাও বলেছেন। জীবনানন্দের 'বোধ' কবিতা আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে, কবিতার মধ্যে 'আমিত্ব' বিস্তৃত স্থান জুড়ে থাকলেও 'শেষের দুই স্তবকে আকাশের নক্ষত্রপথ ত্যাগ করে মানব-মানবীর ও শিশুদর মুখে আহ্লাদ সন্ধানের যে আগ্রহ তা ভাববাদী হলেও অস্তর্থ্যক এবং তা 'তিমিরবিলাসী' নয়, 'তিমির বিনাশী'।[৩২]

বিমল মুখোপাধ্যায় ইতিহাস ও অর্থনীতির জগতের দুই মহীরূহ কার্লমার্কস ও এঙ্গেলস সূচিত বিশ্ব-বীক্ষার আলোকে সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের আলোচনাকে প্রাসঙ্গিক করে তোলেন এই গ্রন্থে। পূর্ববর্তী অতীন্দ্রিয়তা ও ভাববাদ থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করে বিজ্ঞানসম্মত 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী' তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে মানবমন ও জীবনে শিল্প ও সাহিত্যের ব্যাপক ও সক্রিয় প্রভাব অনুসন্ধান করেছেন। ফলত সাহিত্যতত্ত্বে মার্কসীয় ভাবনার সাযুজ্য ও প্রতিফলনের কারণে এই গ্রন্থ আমাদের বিশেষ মনোযোগের বিষয় হয়ে ওঠে। প্রাবন্ধিকের মতে, 'শুধুমাত্র শিল্প-সাহিত্যের স্বরূপ ও তার আস্বাদন পদ্ধ তির বিভিন্নতার আলোচনাতেই মার্কসীয় তথ্যের মূল্য শেষ হওয়ার নয়। ইতিহাসের অনিবার্য কার্য-কারণ সূত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে ভবিষ্যতের রূপাঙ্কন ও সাম্যবাদী সমাজের সামাজিক এবং নান্দনিক সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য প্রকাশই মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব ভাবনার মূল কথা। তিনি আরও মনে করেন যে, 'সাহিত্য প্রগতি মানে যদি হয় সমাজ ও ইতিহাসে যে প্রগতিশীল শক্তির আধিপত্য ও বিস্তার—তারই প্রয়োগ, তাহলে সাম্যবাদী আদর্শের প্রচার নিঃসন্দেহে একটি স্তরে সাহিত্যের প্রগতি লক্ষণ বলে চিহ্নিত হওয়া উচিত।'[৩৩] যদিও তিনি বিশ্বাস করেন, সাহিত্যের প্রচারধর্মিতা সাহিত্যের মানকে ক্ষুন্ন করে। তবুও আজকের পেরেস্ত্রৈকা পরবর্তীযুগে দাঁড়িয়েও তিনি মনে করেন মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের বিশ্বভূমির গুরুত্ব তো কমেইনি, বরং পুনর্নির্মিত হচ্ছে তার নান্দনিক গুরুত্ব ও সৃষ্টির প্রেক্ষিত।

বিমলবাবু তথ্য ও তত্ত্বের গভীর গহন আকরণের সূত্রে, প্রচলিত বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ বিধি থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে বিষয় গ্রন্থনাকে যুক্তিনির্ভর চিন্তাবিন্যাসের পরম্পরায় সংযুক্ত করেছেন। নানা স্তরে নানা পর্যায়ে তিনি সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের যুগ্ম নির্মিতিবিন্যাসকে প্রবন্ধের আধার ও আধেয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সন্দেহ নেই, তাঁর প্রত্যেক প্রবন্ধ গ্রন্থ নতুন করে আমাদর ভাবতে সাহায্য করবে।

গ. রবীন্দ্রসাহিত্যের বৈচিত্র্যময় আবহ

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনন্দনতত্ত্ব' গ্রন্থটির ভূমিকা বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। এটা শুধু এই কারণে নয় যে, ১৯৭২ সালে এই গবেষণাগ্রন্থ প্রণয়ন করেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেছিলেন বরং এই জন্য অগ্রগণ্য যে, রবীন্দ্রনন্দনতাত্ত্বিক হিসাবে তিনি বাংলা সাহিত্যজগতে একজন পরিচিত ও সর্বমান্য জ্যোতিষ্ক।

একথা তো স্বতঃসিদ্ধ যে রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই ছিলেন কবি, ভাবুক ও সৌন্দর্য স্রষ্টা। সাহিত্যরচনার কালে এর তাত্ত্বিক দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি তাঁর রচনার ডালি সাজাননি। কিন্তু সেই অপার্থিব রচনাবলীর নন্দনকারুকলায় বিচরণ করতে করতে, ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার শোভায় আলোকিত করতে করতে বৃহত্তর পাঠক ও গবেষক সমাজের কাছে অনুভবের এক সিংহদরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন প্রাবন্ধিক বিমলবাবু।

সমগ্র রবীন্দ্রসৃষ্টিকে কালানুক্রমিকভাবে বিভাজিত করেছেন প্রাবন্ধিক। সঙ্গে দিয়েছেন অপূর্ব শিল্পক্ষম দু'চারটি শব্দবন্ধ দিয়ে অননুকরণীয় কয়েকটি নামকরণ। কিন্তু এর সঙ্গে উল্লেখ

করতে ভোলেননি, বাংলা সাল অনুযায়ী ঠিক কোন্ সময়ে সাহিত্যকর্ম তিনি অধ্যায়ের আলোচনার মধ্যে এনেছেন। যুগবিভাগের জন্য নির্দিষ্টকারণকে তিনি গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন নতুন পটপরিবর্তনের কারণটিকে। যেমন, '১২৯২র চৈত্র সংখ্যার পর 'বালক' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ১৯২৩-র বৈশাখে 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'ভারতী ও বালক' নামে নতুন পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে'[৩৪] কিংবা '১৩০৫ সালে ভারতীর সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেও পরবর্তীতে সম্পাদকতা পরিত্যাগ বিষয়ক নানা ঘটনাবলীর এক স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরেন প্রাবন্ধিক। রবীন্দ্রনন্দনতাত্ত্বিক চিন্তার ক্ষেত্রে বিমলবাবুর নতুন নতুন অধ্যায় সৃজনা (খ্যাতি এসে অনাবৃত মধ্যাহ্ন রৌদ্রে ভেঙে গেল ১২৯৩-১৩১০' বা 'প্রতিকূল পরীক্ষায় ভাগ্য আমাকে করেনি ১৩০৫-১৩১৪ ইত্যাদি) উপর প্রাজ্ঞ অভিনিবেশের পরিচয়বহ।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখিনতা ও বহুগামীতা নিয়ে গ্রন্থটি রচিত হলেও বহুপাঠের অভিজ্ঞ তাসমৃদ্ধ প্রাবন্ধিক এখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন লেখক, সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদের ভাবনা চিন্তার মনোলোককে এক মুঠোর মধ্যে পাঠক ও গবেষক দুজনকেই কাছে নিয়ে আসেন। পাঠক ও গবেষক সহজেই বঙ্কিম থেকে তলস্তয়। রাস্কিন থেকে প্লেটো আবার প্রাচ্য নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দবর্ধন, ভট্টনায়ক বা অভিনব গুপ্ত পর্যন্ত এক সম্পূর্ণ বৃত্তে মানসভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে পারেন। আর মূল তত্ত্বের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি, সত্য, আনন্দ ও সৌন্দর্য সম্পর্কিত ভাবনা, সত্য ও সুন্দরের ভাবনা, বিশেষ ও নির্বিশেষ সত্য হয়ে আলোচনা এগিয়ে চলে সৌন্দর্যসত্যের অভিন্নতায়, চলে যায় আত্মার আনন্দ ও সাহিত্যের আনন্দবোধ জাগানোর অপার্থিবতায়।

তবে শুধু সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় নয়—রবীন্দ্রনাথের জীবনের অপরাধে যখন কল্লোল-এর আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। যখন রাজনীতির ক্ষেত্রে ও সমাজের ক্ষেত্রে জেগে উঠেছিল নানা অন্ধ আনুগত্য বা উন্মত্ততার অন্য তাড়না তখনও রবীন্দ্রনাথ স্থির প্রত্যয়ে মতামত জানিয়েছেন। বিষয়ের আত্মতা বা বিষয়মুখীনতা যখন বিশ শতকের কাব্য কবিতায় প্রাধান্য পেলে, লেখক দেখিয়েছেন তখনই গুরুত্ব পেল দ্রষ্টব্যতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা, এই প্রয়োজনীয় উপকরণের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন সাহিত্যের আধুনিকতা বিষয়ে। এবং শেষ পর্যন্ত সম্যক তত্ত্ব ও বোধকে বিচার করে তিনি মহাকালকে বসিয়েছেন বিচারকের আসনে। এমনি নানা গবেষণাঋদ্ধ বার্তা দিয়েছেন প্রাবন্ধিক এই গ্রন্থে।

রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কিত বহু অন্তর্দৃষ্টি পূর্ণ পর্যবেক্ষণে সমৃদ্ধ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র সাহিত্য ঃ স্বতন্ত্র পাঠ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে রবীন্দ্রসাহিত্য বিচার করেছেন তিনটি পদ্ধতিতে অবলম্বনে - ১. মনন বৈচিত্র্যের পাঠ-সূচিপত্র অনুযায়ী এই অংশে প্রাবন্ধিক, রবীন্দ্রনাথের সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, সাহিত্য ভাবনার সমান্তরালে বর্তমান সময়ের নিরিখে রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠের গুরুত্ব এবং 'রবীন্দ্রসাহিত্যতত্ত্বের ঐতিহ্য-অঙ্গীকারকে ধরার চেষ্টা করেছেন, ২. কবিতার ভাষা-শৈলীগত পাঠ-এখানে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের বিশেষ কয়েকটি পর্বের আলোকে কবিতা ও তার ভাষা-শৈলী বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখেছেন,

৩. তুলনামূলক পাঠ-এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ভুবনকে এলিয়ট, কিটস, ক্রোচে, মার্কসের 'বৈশ্বিক' ভাবনার একাসনে বসিয়ে তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন।

রবীন্দ্রসাহিত্যব্যাখ্যায় বিভিন্ন কবি-সমালোচকের মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য থেকে উঠে আসা নানা প্রশ্নের সমাধানে প্রাবন্ধিক যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তাকে কুর্নিশ জানানোর স্পর্ধা আমাদের নেই। তবুও তিনি যখন আমাদের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, এখনও কি রবীন্দ্রমননের হীরের ধারে পশ্চিমের অনেক চাকচিক্য সর্বসব কাঁচের জানালা টুকরো হয়ে যায় না?'[৩৫] তখন প্রজ্ঞা-গর্ব-ভালোলাগা—সবকোনো এক বিন্দুতে এসে মিলে যায়। সেই বিন্দু বিচ্ছুরিত হয় প্রবন্ধের প্রতিটি শব্দে শব্দে, গদ্যে গদ্যে। প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনার, শিক্ষা ভাবনার কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা নেই, তাঁর সীমাহীন প্রকাশ কোনো নির্দিষ্ট কাঠামোর ঘেরাটোপে বন্দী নয়। তাঁর সাহিত্য-বিশ্ব যেন সার্বিক বিশ্বজনীনতার আগল খুলে দেয়। আসলে তিনিও তো নিজেকে কোনোদিন কাল ও সীমার সীমায়িত পরিসরে আবদ্ধ রাখেননি। তাঁর উন্মুক্ত উদারতা, 'আজকের শতকের পাঠকের কাছে ভিন্ন মাত্রা নিয়ে আসে এবং উপলব্ধি ঘটায় যে, সুস্থ সংস্কৃতির পথে বহিরাগতের সঙ্গে দেশীয় ঐতিহ্যের ভাব সম্মিলন একান্ত জরুরি; নইলে পরিগ্রহণের দ্বারা গোটা বিশ্বকে একটি নীড়ে পরিণতি দেওয়া অসম্ভব।'[৩৬] প্রাবন্ধিকের এই উচ্চারণ প্রবন্ধ শিল্পের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেও সৎ ও আত্মবিশ্বাসী।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী সমন্বয়বাদের উজ্জ্বল আকর। একাধিক প্রবন্ধে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনকে প্রত্যাশা করেছেন, হিন্দু-মুসলমানকে এক সূত্রে বাঁধতে চেয়েছেন। সনাতন ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা যে সমন্বয়বাদের আদর্শে নিহিত আছে, সে কথা জানাতেও কার্পণ্য করেননি প্রাবন্ধিক। তাঁর মতে, 'রবীন্দ্রনাথ ঐক্যনীতিতে বিশ্বাসী, একাকার নীতিতে নয়, তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী, এই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ পারস্পরিক নির্ভরতায় সার্থক।'[৩৭] শিক্ষানীতির ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের যুগোপযোগী ভাবনা আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। আজ পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শ মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর কুক্ষীগত। তাই প্রাবন্ধিকের সুচিন্তিত ও দৃপ্ত পরামর্শ, 'দায়িত্ববোধহীন রাষ্ট্র-নায়কেরা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিকে ব্যবসায়িক স্বার্থান্বেষীদের হাতে তুলে দেওয়ার আগে অন্তত আর একবার স্মরণ করুক সেই মানুষটিকে, নাম যাঁর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'[৩৮] এই উচ্চারণ শ্লেষের চাবুক হয়ে আমাদের অন্তঃসার শূন্য শিক্ষাবোধের উপর আছড়ে পড়ে।

দ্বিতীয়পর্বে রবীন্দ্রকবিতা আলোচনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকের বিষয় উপযোগী তথ্যানুষঙ্গ, যুক্তিবিন্যাস, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী এবং স্পষ্ট ও সংযত বাক্‌বৈভব—আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কৌতূহলী ও উৎসাহী করে তোলে। 'মানসী'র 'অহল্যার প্রতি', 'একাল ও সেকাল', 'মেঘদূত', 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে এখানে কবির ভাবকল্পনা বা imagination প্রকাশের মাধ্যম বা structure এর সহায়তা করেছে।'[৩৯] শব্দব্রহ্ম তো কবিতার প্রাণ আর শব্দ অক্ষর নির্মিত। প্রতিটি অক্ষর থেকে শব্দ, স্তবক প্রত্যেকেই এক সূত্রে বাঁধা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা শব্দনির্মোক উন্মোচনের সার্থকতায় দীপ্ত,

এ যেন কবির সঙ্গে শিল্পীর সহবাস।

তৃতীয় পর্বের প্রত্যেকটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিট্‌স, মার্কস, ক্রোচে, এলিয়টের সাহিত্যতত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্বের স্বরূপ-সাদৃশ্যের তুলনামূলক বিচার রয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সত্য, সুন্দর, সৃষ্টি, সাহিত্যের ভাব ও রূপের কথা প্রসঙ্গ।

পরিশেষে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় জীবন-কর্ম-চিন্তার এক পারস্পরিক সাযুজ্যে তিনি ক্লান্তিহীন গবেষক। ভাষা ও বিষয়ের প্রতি আকর্ষণের সূত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন তাঁকে নিয়ে আসে নিজস্ব তত্ত্ববিশ্বের ভিত্তিভূমিতে। তিনি ধ্রুপদী চিন্তাধারার সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে সহজ, স্বাচ্ছন্দ।

তথ্যসূত্র

১ বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যের মানচিত্র ঃ দ্বীপ থেকে মহাদেশ। দে'জ পাবলিশিং ঃ কলকাতা জানুয়ারি ১৯৯৬। পৃ. ৬ (ভূমিকা)।

২ তদেব, পৃ. ১৬।

৩ তদেব পৃ. ৪৩।

৪ বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়। এক আকাশ ঃ দুই নক্ষত্র তারাশঙ্কর-জীবনানন্দ, এবং মুশায়েরা ঃ কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৮, পৃ. ২১।

৫ তদেব। পৃ.২১।

৬ তদেব। পৃ. ২৭।

৭ তদব। পৃ. ২৮।

৮ তদেব। পৃ. ৩০।

৯ বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়। এক আকাশ ঃ দুই নক্ষত্র তারাশঙ্কর-জীবনানন্দ। প্রাকুক্ত। পৃ.৬৬।

১০ তদেব। পৃ. ৭৫।

১১ তদেব। পৃ. ৮৩।

১২ T.S. Eliot 'Little Gidding : Four Quarters, Houghtor Mifflin Harcourt, 2014, P.57

১৩ জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভারবি ঃ কলকাতা, দ্বিতীয় ভারবি সংস্করণ। জানুয়ারি ১৯৮৪। পৃ. ১৪০।

১৪ বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়। এক আকাশ ঃ দুই নক্ষত্র তারাশঙ্কর-জীবনানন্দ। প্রাগুক্ত। পৃ.১৩৭।

১৫ বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য ঃ সত্য ও সুন্দরের অন্তরমহলে। এবং মুশায়েরা ঃ কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, অগাস্ট ২০১১। পৃ. ১৬।

১৬ তদেব, পৃ. ২৪।

১৭ তদেব। পৃ. ৩১।

১৮ তদেব। পৃ. ৩৭।

১৯ তদেব। পৃ. ৪৫।

২০ তদেব, পৃ. ৪৬।

২১ তদেব। পৃ. ৫৪।

২২ তদেব, পৃ. ৮০।

২৩ জীবনানন্দ দাশ। বনলতা সেন। নিউ স্ক্রিপ্ট ঃ কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। সেপ্টেম্বর ২০১০। পৃ. ১০৪।

২৪ তদেব, পৃ. ১১৮।

২৫ তদেব। পৃ. ১২২।

২৬ তদেব। পৃ. ১৩১।

২৭ তদেব। পৃ. ১৩৭।

২৮ তদেব। পৃ. ২৩৭।

২৯ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যবিবেক। দে'জ পাবলিশিং ঃ কলকাতা। তৃতীয় সংস্করণ। জানুয়ারি ২০০৩। পৃঃ১২।

৩০ তদেব। পৃ. ১৯।

৩১ তদেব। পৃ. ২৪০।

৩২ বিমলকুমার মুখেপাধ্যায়। মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব। দে'জ পাবলিশিং ঃ কলকাতা। তৃতীয় সংস্করণ। জানুয়ারি ২০১৮। পৃ. ১০০-১০১।

৩৩ তদেব, পৃ. ১৩৫।

৩৪ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনন্দন তত্ত্ব। দে'জ পাবলিশিং ঃ কলকাতা। তৃতীয় সংস্করণ। এপ্রিল ২০০৭। পৃ. ৩০।

৩৫ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রসাহিত্য ঃ স্বতন্ত্র পাঠ। এবং মুশায়েরা ঃ কলকাতা। প্রথম প্রকাশ। আগস্ট ২০০৯। পৃ. ১৩

৩৬ তদেব। পৃ. ৪১।

৩৭ তদেব। পৃ. ৬৮।

৩৮ তদেব। পৃ. ৮২।

৩৯ তদেব। পৃ. ১১৯।